কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৫
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৫

সূরা রা'দ ১-৭ আয়াত

নামকরণ

তের নম্বর আয়াতের وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ বাক্যাংশের "আর্ রা'দ" শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ নামকরণের মানে এ নয় যে, এ সূরায় রা'দ অর্থাৎ মেঘ গর্জনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বরং এটা শুধু আলামত হিসেবে একথা প্রকাশ করে যে, এ সূরায় "রাদ" উল্লেখিত হয়েছে বা "রা'দ"-এর কথা বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

৪ ও ৬ রুকূ'র বিষয়বস্তু সাক্ষ্য দিচ্ছে, এ সূরাটিও সূরা ইউনূস, হূদ ও আ'রাফের সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে। বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত শুরু করার পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। বিরোধী পক্ষ তাঁকে লাঞ্ছিত করার এবং তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। মুমিনরা বারবার এ আকাংখা পোষণ করতে থাকে, হায়! যদি কোন প্রকার অলৌকিক কান্ড-কারখানার মাধ্যমে এ লোকগুলোকে সত্য সরল পথে আনা যায়। অন্যদিকে আল্লাহ মুসলমানদেরকে এ মর্মে বুঝাচ্ছেন যে, ঈমানের পথ দেখাবার এ পদ্ধতি আমার এখানে প্রচলিত নেই আর যদি ইসলামের শত্রুদের রশি ঢিলে করে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এটা এমন কোন ব্যাপার নয় যার ফলে তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। তারপর ৩১ আয়াত থেকে জানা যায়, বার বার কাফেরদের হঠকারিতার এমন প্রকাশ ঘটেছে যারপর ন্যায়সংগতভাবে একথা বলা যায় যে, যদি কবর থেকে মৃত ব্যক্তিরাও উঠে আসেন তাহলেও এরা মেনে নেবে না বরং এ ঘটনার কোন না কোন ব্যাখ্যা করে নেবে। এসব কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সূরাটি মক্কার শেষ যুগে নাযিল হয়ে থাকবে।

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু

সূরার মূল বক্তব্য প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু পেশ করছেন তাই সত্য কিন্তু এ লোকেরা তা মেনে নিচ্ছে না, এটা এদের ভুল। এ বক্তব্যই সমগ্র ভাষণটির কেন্দ্রীয় বিষয়। এ প্রসংগে বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাওহীদ, রিসালাত ও পরকালের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি ঈমান আনার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফায়দা বুঝানো হয়েছে। এগুলো অস্বীকার করার ক্ষতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সংগে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, কুফরী আসলে পুরোপুরি একটি নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর এ সমগ্র বর্ণনাটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বুদ্ধি-বিবেককে দীক্ষিত করা নয় বরং মনকে ঈমানের দিকে আকৃষ্ট করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণ পেশ করেই শেষ করে দেয়া হয়নি, এ সংগে এক একটি দলীল এ এক একটি প্রমাণ পেশ করার পর থেমে গিয়ে নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন, উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং স্নেহপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অজ্ঞ লোকদের নিজেদের বিভ্রান্তিকর হঠকারিতা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

ভাষণের মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের আপত্তিসমূহের উল্লেখ না করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর দাওয়াতের ব্যাপারে লোকদের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল অথবা বিরোধীদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা হয়েছে। এ সংগে মুমিনরা কয়েক বছরের দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামের কারণে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিল এবং অস্থির চিত্তে অদৃশ্য সাহায্যের প্রতীক্ষা করছিল, তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্বের সূরা, সূরা ইউসুফের শুরুতে কুরআনে হাকীমের সত্যতার বিবরণ ছিল এনং সুরার শেষেও এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ঠিক এভাবে এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়েছে এবং বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ এবং তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হিকমতের আলোচনা রয়েছে, এরপর আখেরাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। যারা নবুয়তকে অস্বীকার করে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে ।

পূর্ববর্তী সূরার শেষে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে- এটা কারো বানানো কথা নয়, বরং এ হলো তার পূর্ববর্তী কথারই অনুকূল, প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং হেদায়েত ও রহমত । ঠিক এমনিভাবে এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে- এগুলো কিতাবেরই আয়াতসমূহ । হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু নাজিল হয়েছে তা ধ্রুব সত্য, সন্দেহাতীত । কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না, তার প্রতি ঈমান আনে না। এমন উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহকে তারা অস্বীকার করে।

সূরা রাদে তাওহীদ, রেসালাত এবং কিয়ামতের আলোচনা রয়েছে আর পরবর্তী সূরা ইব্রাহীমেও অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এ বিষয়সমূহের প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সূরা রাদের শুরুতে কুরআন নাজিল হওয়ার ঘোষণা ছিল, আর সূরা ইব্রাহীমের শুরুতে কুরআনে কারীম নাজিল করার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো মানুষের গোমরাহির অন্ধকার থেকে হেদায়াতের আলোর দিকে নিয়ে আসা। এমনিভাবে সূরা রাদ ও সূরা ইব্রাহীমে ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেরদের চক্রান্তের উল্লেখ রয়েছে।

الٓمٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِۗ وَٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤۡمِنُونَ

১. আলিফ লাম-মীম-রা, এগুলো কিতাবের আয়াত, আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা সত্য; কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই ঈমান আনে না।

আয়াতের প্রথমে "এগুলো কিতাবের আয়াত আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে তা সত্য" বলে কি বুঝানো হয়েছে তাতে দুটি মত রয়েছে। এক. এখানে "এগুলো কিতাবের আয়াত" বলে কুরআনের পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবসমূহকে বুঝানো হয়েছে, [তাবারী; বাগভী] আর তখন "আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে" বলে কুরআনকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে [তাবারী] দুই. এখানে "এগুলো কিতাবের আয়াত" বলে কুরআনুল করীম আল্লাহর কালাম এবং "আর যা আপনার রব এর পক্ষ হতে আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে" বলে কুরআনই বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] সে মতে আয়াতের অর্থ এই যে, এই কুরআনে যেসব বিধি-বিধান আপনার প্রতি নাযিল হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত। সেগুলোকে আঁকড়ে ধরুন।

এখানে মাত্র কয়েকটি শব্দে সমগ্র বক্তব্যের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। বক্তব্যের লক্ষ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ বলছেনঃ হে নবী! তোমার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এ শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি এটা তোমার প্রতি নাযিল করেছি এবং লোকেরা মানুক বা না মানুক এটাই সত্য। এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর মূল ভাষণ শুরু হয়ে গেছে। তাতে অস্বীকারকারীদেরকে এ শিক্ষা সত্য কেন এবং এর ব্যাপারে তাদের নীতি কতটুকু ভুল-একথা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ভাষণটি বুঝতে হলে শুরুতেই এ বিষয়টি সামনে থাকা প্রয়োজন যে, নবী ﷺ সে সময় যে জিনিসটির দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা তিনটি মৌলিক বিষয় সমন্বিত ছিল।

- এক, প্রভুত্বের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। এ কারণে তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদাত ও বন্দেগী লাভের যোগ্য নয়।
- দুই, এ জীবনের পরে আর একটি জীবন আছে। সেখানে তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কার্যক্রমের জবাবদিহি করতে হবে।
- তিন, আমি আল্লাহর রসূল এবং আমি যা কিছু পেশ করছি নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করছি।

এ তিনটি মৌলিক কথা মানতে লোকেরা অস্বীকার করছিল। এ কথাগুলোকেই এ ভাষণের মধ্যে বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এগুলো সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ ও আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

২. আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

আয়াতে এক অনুবাদ উপরে করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহকে কোন খুঁটি ব্যতীত উপরে উঠিয়েছেন, তোমরা সে আসমানসমূহকে দেখতে পাচ্ছ। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] অর্থাৎ আল্লাহ এমন এক সত্তা, যিনি আসমানসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আসমানসমূহকে এ অবস্থায়ই দেখ। এ অর্থের স্বপক্ষে আমরা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র দেখতে পাই সেখানে বলা হয়েছে, "আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পড়ে না যায় পৃথিবীর উপর তার অনুমতি ছাড়া।" [সূরা আল-হাজ্জঃ ৬৫] তবে আয়াতের অন্য এক অনুবাদ হলো, আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে অদৃশ্য ও অননুভূত স্তম্ভসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ অনুবাদটি ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদা রাহেমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] তবে ইবন কাসীর প্রথম তাফসীরকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

কুরআনুল কারীমের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ আয়াতে تَرَوْنَهَاবলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে (وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ) [সূরা আল-গাশিয়াহঃ ১৮] বলা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনায় এটা এসেছে যে, যমীনের আশেপাশে যা আছে যেমনঃ বাতাস, পানি ইত্যাদি প্রথম আসমান এ সবগুলোকে সবদিক থেকে সমভাবে বেষ্টন করে আছে। যে কোন দিক থেকেই প্রথম আসমানের দিকে যাত্রা করা হউক না কেন তা পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বে রয়েছে। আবার প্রথম আসমান বা নিকটতম আসমানের দূরত্বও পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের মত। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় আসমানও প্রথম আসমানকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছে। এ দুটোর দূরত্ব পাঁচশত বছরের

পথের দূরত্বের মত। আবার দ্বিতীয় আসমানের পুরুত্বও পাঁচশত বছরের রাস্তার মত। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানও তদ্রুপ দূরত্ব ও পুরত্ব বিশিষ্ট।

এ আসমানসমূহকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজস্ব ক্ষমতাবলে কোন প্রকার বাহ্যিক খুঁটি ব্যতীতই ধারন করে রেখেছেন। সেগুলো একটির উপর আরেকটি পড়ে যাচ্ছেনা এটা একদিকে যেমন তাঁর মহা শক্তিধর ও ক্ষমতাবান হওয়া নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে অন্যদিকে আসমান ও যমীন যে কত প্রকাণ্ড সৃষ্টি তার এক প্রচ্ছন্ন ধারণা আমাদেরকে দেয়। [ইবন কাসীর] মহান আল্লাহ বলেন, "মানুষকে সৃষ্টি করা অপেক্ষা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।" [সূরা গাফেরঃ ৫৭] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং তাদের মত পৃথিবীও, তাদের মধ্যে নেমে আসে তার নির্দেশ; যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" [সূরা আত-তালাকঃ ১২] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাত আসমান ও এর ভিতরে যা আছে এবং এর মাঝখানে যা আছে তা সবই কুরসীর মধ্যে যেন বিস্তীর্ণ যমীনের মধ্যে একটি আংটি আর কুরসী হলো মহান আরশের মধ্যে তদ্রুপ একটি আংটি স্বরূপ যা এক বিস্তীর্ণ যমীনে পড়ে আছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আর আরশ তার পরিমাণ তো মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ নির্ধারণ করে বলতে পারবে না। [তাবারী]

তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন- এর ব্যাখ্যা সূরা বাকারাহ এবং সূরা আল-আ'রাফে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে সংক্ষেপে এখানে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ আরশের উপর উঠার ব্যাপারটি তাঁর একটি বিশেষ গুণ। তিনি আরশের উপর উঠেছেন বলে আমরা স্বীকৃতি দেব। কিন্তু কিভাবে তিনি তা করেছেন তা আমাদের জ্ঞানের বাইরের বিষয়।

এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে। আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে তিনি সৃষ্টিকুলের উপকারের জন্য, তার বান্দাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিয়োজিত করেছেন, মূলত: প্রতিটি সৃষ্টিই স্রষ্টার আজ্ঞাধীন। [কুরতুবী] যে কাজে তাদেরকে আল্লাহ নিয়োজিত করেছেন তারা অহর্নিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু কোন সময় তাদের গতি চুল পরিমাণও কম-বেশী হয়নি। তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোন সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। [কুরতুবী]

প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে আয়াতে উল্লেখিত أَجَل শব্দটির মূল অর্থঃ সময়। তবে অন্যান্য অর্থেও এর ব্যবহার আছে। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ বর্ণনায় কয়েকটি মত রয়েছেঃ

এক. এখানে (أَجَلٍ مُسَمًّى) বা সুনির্দিষ্ট মেয়াদ বলতে বুঝানো হয়েছে যে, চাঁদ ও সূর্য কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে চলতে থাকবে। যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে, চাঁদকে নিষ্প্রভ করা হবে, তারকাসমূহ আলোহীন হয়ে পড়বে আর গ্রহ নক্ষত্রগুলো খসে পড়বে, তখন পর্যন্ত এগুলো চলবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।" [সূরা ইয়াসীনঃ ৩৮] এখানে গন্তব্য বলে সুনির্দিষ্ট সময়ও উদ্দেশ্য হতে পারে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

দুই. কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক গ্রহের জন্যে একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সব সময় নিজ নিজ কক্ষপথে নিধারিত গতিতে চলমান থাকে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথ এক মাসে এবং সূর্য এক বছরে অতিক্রম করে। [কুরতুবী]

তিন. অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহ সেগুলোকে সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানের প্রতি ধাবিত করান। আর সে গন্তব্যস্থান হলো আরশের নীচে। এ ব্যাপারে সহীহ হাদীসে বিস্তারিত এসেছে সূরা ইয়াসীনে যার বর্ণনা আসবে। [ইবন কাসীর]

তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন অর্থাৎ তিনি আয়াতসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। এর মানে, আল্লাহ্ তাআলা অপার শক্তির নিদর্শনাবলী তিনি বর্ণনা করছেন। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ তিনি বিস্তারিত প্রমাণ পেশ করছেন যে, যিনি পূর্ব বর্ণিত কাজগুলো করতে পারেন তিনি অবশ্যই মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় আনতে সক্ষম। [কুরতুবী] এগুলো আরও প্রমাণ করছে যে, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাঁর সৃষ্টিকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। [ইবন কাসীর]

যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা এজন্য কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে আখেরাত ও কেয়ামতে বিশ্বাসী হও এবং সত্য বলে মেনে নাও। [বাগভী] কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর আখেরাতে মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহর শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভব হবে না।

وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَٰرًا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

৩. আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ়পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং সব রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

পূর্বের আয়াতে উপরস্থিত আসমানের নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছেন। আর এখানে নিচের বা যমীনের নিদর্শনাবলী বর্ণনা করছেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। [ফাতহুল কাদীর] কুরআনুল কারীম সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সম্বোধন করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্ট জীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পর্বত-শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য কোন চৌবাচ্চা নেই এবং তা তৈরি করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কুপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

সব রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় অর্থাৎ এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল-ফসল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলফসলের দু'প্রকার সৃষ্টি করছেনঃ লাল-হলুদ, টক-মিষ্টি। [বাগভী] তবে এর অর্থ দুই না হয়ে একাধিক হতে পারে যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হবে। তাই বিষয়টি (زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি ফলই দু'প্রকার হয়, রঙের দিক থেকে যেমন, সাদা-কালো, অথবা স্বাদের দিক থেকে যেমন, মিষ্টি-টক, অথবা আকৃতির দিক থেকে যেমন, বড়-ছোট, অথবা অবস্থাগত দিক থেকে যেমন, গরম ও ঠাণ্ডা। [ফাতহুল কাদীর] কারও কারও মতে, زَوْجَيْنِএর অর্থ নর ও মাদী হওয়া। [কুরতুবী]

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন আল্লাহ তা'আলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। অর্থাৎ দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন; যেমন কোন উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে কালো করে দেয়া হয়। ফলে স্বচ্ছ শুভ্র উজ্জ্বল থাকার পর সেটা অন্ধকার কালোতে রূপান্তরিত হয়। [ফাতহুল কাদীর] আবার আরেক অর্থে, তিনি এ দু'টিকে এমন করেছেন যে, এর প্রত্যেকটি অপরটিকে তাড়িয়ে বেড়ায়। [ইবন কাসীর] একটি যাওয়ার সাথে সাথে আরেকটি আসবেই। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও তাদের বাসস্থান যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন তেমনি তিনি সময়ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

উপরে বিশ্ব-জাহানের যে নিদর্শনাবলীকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে সেগুলোতে কেউ চিন্তাভাবনা করলে অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাবে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পরিচালক একজনই আর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন, আল্লাহর আদালতে মানুষের হাযির হওয়া এবং পুরষ্কার ও শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব খবর দিয়েছেন সেগুলো সবই সত্য। [বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

وَفِي ٱلۡأَرۡضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ وَجَنَّٰتٌ مِّنۡ أَعۡنَٰبٍ وَزَرۡعٌ وَنَخِيلٌ صِنۡوَانٌ وَغَيۡرُ صِنۡوَانٍ يُسۡقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعۡضَهَا عَلَىٰ بَعۡضٍ فِي ٱلۡأُكُلِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَعۡقِلُونَ

৪. আর যমীনে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড, আঙ্গুর বাগান, শস্যক্ষেত্র, একই মূল থেকে উদগত বা ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে উদগত খেজুর গাছ যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর স্বাদ-রূপের ক্ষেত্রে সেগুলোর কিছু সংখ্যককে আমরা কিছু সংখ্যকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। নিশ্চয় বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা নতুন করে অন্য আরেক প্রকার নিদর্শন পেশ করছেন। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ সারা পৃথিবীকে তিনি একই ধরনের একটি ভূখণ্ড বানিয়ে রেখে দেননি। বরং তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য ভূখণ্ড, এ ভূখণ্ডগুলো পরস্পর সংলগ্ন থাকা সত্ত্বেও আকার-আকৃতি, রং, গঠন, উপাদান, বৈশিষ্ট, শক্তি ও যোগ্যতা এবং উৎপাদনে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এ গুলোর কোনটি এমন যে, তাতে শস্য উৎপন্ন হয় আবার কোন কোনটি একেবারে অকেজো ভূমি যাতে কোন কিছুই উৎপন্ন হয়না অথচ এ দু'ধরনের ভূমিই পাশাপাশি অবস্থিত। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

এ বিভিন্ন ভূখণ্ডের সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে নানা প্রকার বিভিন্নতার অস্তিত্ব এত বিপুল পরিমান জ্ঞান ও কল্যাণে পরিপূর্ণ যে, তা গণনা করে শেষ করা যেতে পারে না। এ ভুখণ্ড লাল, অপরটি সাদা, কোনটি হলুদ, কোনটি মিহি, অথচ সবগুলোই পাশাপাশি। প্রতিটি তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আছে। এসব কিছুই প্রমাণ করছে যে, একজন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ক্ষমতাধর সত্তা রয়েছেন যিনি এগুলো করেছেন। তিনিই একমাত্র ইলাহ, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই একমাত্র রব, তিনি ব্যতীত আর কোন রব নেই। [ইবন কাসীর] তাছাড়া কোন কোন ভূমি পাশাপাশি নয় অথচ তাদের মধ্যে একই ধরণের শক্তি, যোগ্যতা পাওয়া যায়। এখানে পাশাপাশি নয় এ কথাটি উহ্য থাকতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

কিছু কিছু খেজুর গাছের মূল থেকে একটি খেজুর গাছ বের হয় আবার কিছু কিছুর মূল থেকে একাধিক গাছ বের হয়। [ফাতহুল কাদীর]

যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর স্বাদ-রূপের ক্ষেত্রে সেগুলোর কিছু সংখ্যককে আমরা কিছু সংখ্যকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি।- এ আয়াতে আল্লাহর তাওহীদ এবং তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শনাবলী দেখানো ছাড়া আরো একটি সত্যের দিকেও সূক্ষ্ম ইশারা করা হয়েছে। এ সত্যটি হচ্ছে, আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের কোথাও এক রকম অবস্থা রাখেননি।

একই পৃথিবী কিন্তু এর ভূখণ্ডগুলোর প্রত্যেকের বর্ণ, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলাদা। একই জমি ও একই পানি, কিন্তু তা থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছ কিন্তু তার প্রত্যেকটি ফল একই জাতের হওয়া সত্বেও তাদের আকৃতি, আয়তন, স্বাদ, গন্ধ, রূপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। একই মূল থেকে দুটি ভিন্ন গাছ বের হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজের একক বৈশিষ্টের অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে সে অবশ্যই এতে একজন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সত্তার কার্য সক্রিয় আছে দেখতে পাবে। যিনি তার অসীম ক্ষমতায় এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেছেন সেভাবে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা সবশেষে বলেছেন যে, নিশ্চয় বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য এতে রয়েছে প্রচুর নিদর্শন। [ইবন কাসীর]

নিশ্চয় বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন- বলা হচ্ছে, এই যে পরস্পর পাশাপাশি দুটি ভূমিতে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেন, তন্মধ্যে একই ফল একই জমিতে একই পানি দ্বারা উৎপন্ন করি তারপরও সেটার স্বাদ দু'রকমের হয়। একটি মিষ্ট অপরটি টক। একটি অত্যন্ত উন্নতমানের অপরটি অনুন্নত পর্যায়ের। একটি চিত্তাকর্ষক অপরটি তেমন নয়। এসব কিছুতে কেউ চিন্তা, গবেষণা ও বিবেক খাটালে যে কেউ অবশ্যই মেনে নিতে বাধ্য হবে যে, এর বিভিন্নতার প্রকৃত কারণ এক মহান প্রজ্ঞাময় সত্তার শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, সাধারণত: যে কারণে ফল-ফলাদিতে পার্থক্য সূচিত হয় তা দুটি। এক, উৎপন্নস্থানের ভিন্নতা, দুই পানির গড়মিল। কিন্তু যদি জমি ও পানি একই প্রকার হয়, তারপর যদি সেটাতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ফল পরিলক্ষিত হয় তবে বিবেকবান মাত্রই এটা বলতে বাধ্য হবে যে, এটা সেই অপার শক্তি ও আশ্চর্যজনক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। [ফাতহুল কাদীর]

মুজাহিদ বলেন, এটা মূলত: আদম সন্তানদের জন্য একটি উদাহরণ, তাদের মধ্যে নেককার ও বদকার হয়েছে অথচ তাদের পিতা একজনই। হাসান বসরী বলেন, এ উদাহরণটি আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের হৃদয়ের জন্য পেশ করেছেন। কারণ, যমীন মহান আল্লাহর হাতে একটি কাদামাটির পিণ্ড ছিল। তিনি সেটাকে বিছিয়ে দিলেন, ফলে সেটা পরস্পর পাশাপাশি টুকরায় পরিণত হলো, তারপর তাতে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলো, ফলে তা থেকে বের হলো, ফুল, গাছ ফল ও উদ্ভিদ। আর এ মাটির কোনটি হল খারাপ, লবনাক্ত ও অস্বচ্ছ। অথচ এগুলো সবই একই পানি দিয়ে সিক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষও আদম আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

অতঃপর আসমান থেকে তাদের জন্য স্মরণিকা (কিতাব) নাযিল হলো, কিছু অন্তর নরম হলো এবং বিনীত হলো, আর কিছু অন্তর কঠোর হলো এবং গাফেল হলো। হাসান বসরী বলেন, কুরআনের কাছে কেউ যখন বসে তখন সে সেখান থেকে বেশী বা কম কিছু না নিয়ে বের হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আমরা নাযিল করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" [সূরা আল-ইসরাঃ ৮২] এতে অবশ্যই বিবেকবানদের জন্য প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। [বাগভী]

وَإِن تَعۡجَبۡ فَعَجَبٞ قَوۡلُهُمۡ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِي خَلۡقٖ جَدِيدٍۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلۡأَغۡلَٰلُ فِيٓ أَعۡنَاقِهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

৫. আর যদি আপনি বিস্মিত হন, তবে বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথাঃ মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করব? এরাই তারা, যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে আর এরাই তারা, যাদের গলায় থাকবে শিকল। আর তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

এ আয়াত ও পরবর্তী দুটি আয়াতে কাফেরদের মৌলিক তিনটি সন্দেহ ও তার উত্তর দেয়া হয়েছে। সন্দেহগুলো হচ্ছে, এক. মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব কিতাব অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, "আর কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব যে

তোমাদেরকে বলে, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও অবশ্যই তোমরা হবে নতুনভাবে সৃষ্ট!" (সূরা সাবাঃ ৭] দুই. তাদের দ্বিতীয় সন্দেহটি হচ্ছে, যদি বাস্তবিকই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? তিন. কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক মু'জিযা দেখেছি কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এ সন্দেহ তিনটির উত্তর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য ৫ নং আয়াত এবং পরবর্তী ৬ ও ৭ নং আয়াতে প্রদান করেছেন।

মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করব?- এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, কাফেররা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তার নিদর্শনাবলী ও তার প্রমাণসমূহ দেখে তিনি যা ইচ্ছে করতে সক্ষম এটার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য, তারপর তারা স্বীকার করছে যে, তিনিই সবকিছু প্রথম সৃষ্টি করেছেন, অথচ তিনি যখন প্রথম সৃষ্টি করেছেন তখন তারা কিছুই ছিল না। এতকিছুর পরও যদি কাফেররা প্রতিটি সৃষ্টিকে পুনর্জীবনের বিষয়টির উপর মিথ্যারোপ করে তবে আপনি অবশ্যই আশ্চর্য হবেন। কিন্তু তার চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে, এটা কি সম্ভবপর? [বাগভী; ইবন কাসীর]

কুরআনুল কারীম এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। তবে যেটা অন্য আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির চাইতে অনেক বড় ব্যাপার। আর যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে পারেন তার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অনেক সহজ। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, আপনি আশ্চর্য হবেন যে, কাফেররা আপনার সুস্পষ্ট মু'জিযা এবং নবুওয়াতের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুওয়াত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে? কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে, এটা কি সম্ভবপর? [বাগভী]

কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহর অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য, যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তার পক্ষে পুনবার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হেকমতসহ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনবার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে? আল্লাহ বলেন, "আর তারা কি দেখে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম? অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" [সূরা আল-আহকাফ: ৩৩]

সত্যি বলতে কি, কাফেররা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহর শক্তিকে বুঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন। মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও কাফেরদের পক্ষে নবুওয়াত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেয়ামতের পুনর্জীবন ও হাশরের দিনকে অস্বীকার করা।

এরাই তারা, যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে - তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার পরিণতি সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, তারা এর মাধ্যমে তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। [ইবন কাসীর] কারণ, আখেরাতে মানুষকে পুনর্বার নিয়ে আসা আল্লাহর জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণ। তাদের আখেরাত অস্বীকার ছিল মূলত আল্লাহ, তাঁর শক্তিমত্তা ও জ্ঞান অস্বীকারের নামান্তর। এজন্য তারা কাফের হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

আর এরাই তারা, যাদের গলায় থাকবে শিকল- দুনিয়াতে তারা যেহেতু কুফরী করেছে সেহেতু তাদেরকে আখেরাতে এর পরিণতি ভোগ করতেই হবে। আখেরাতে তাদের পরিণতি হচ্ছে, তাদের গলায় থাকবে শেকল পরানো। গলায় শেকল পরানো থাকা কয়েদী হবার আলামত। তাদের গলায় যে শেকল পরানো হবে তা হবে আগুনের শিকল। [মুয়াসসার] তাদেরকে তা দিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। [ইবন কাসীর]

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

৬. আর তারা ভালোর পূর্বেই মন্দের জন্য তাড়াহুড়ো করছে। অথচ তাদের আগে শাস্তির অনুরূপ বহু (শিক্ষণীয়) দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। আর নিশ্চয় আপনার রব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের যুলুম সত্ত্বেও এবং নিশ্চয় আপনার রব শাস্তি দানে কঠোর।

কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল, যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? কখনো তারা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বলতে থাকেঃ “হে আমাদের রব! এখনই তুমি আমাদের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দাও। কিয়ামতের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রেখো না।” [সূরা সোয়াদঃ ১৬]। আবার কখনো বলতে থাকেঃ “হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথাগুলো পেশ করছে এগুলো যদি সত্যি হয় এবং তোমারই পক্ষ থেকে হয় তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল করো।” [সূরা আল-আনফালঃ ৩২] আবার কখনো তারা রাসূলকেই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে বলতে থাকেঃ “তারা বলে, ‘ওহে যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের কাছে ফিরিশতাদেরকে উপস্থিত করছ না কেন? আমরা ফিরিশতাদেরকে যথার্থ কারণ ছাড়া নাযিল করি না; ফিরিশতারা উপস্থিত হলে তারা অবকাশ পাবে না।” [সূরা আল-হিজরঃ ৬–৮]

এ আয়াতে কাফেরদের পূর্বোক্ত কথাগুলোর জবাব দিয়ে বলা হয়েছেঃ এ মূর্খের দল কল্যাণের আগে অকল্যাণ চেয়ে নিচ্ছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এদেরকে যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে তার সুযোগ গ্রহণ করার পরিবর্তে এরা এ অবকাশকে দ্রুত খতম করে দেয়ার এবং এদের বিদ্রোহাত্মক কর্মনীতির কারণে এদেরকে অনতিবিলম্বে পাকড়াও করার দাবী জানাচ্ছে। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ “তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি নির্ধারিত কাল না থাকত তবে শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর আসত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।” [সূরা আল-আনকাবুতঃ ৫৩–৫৪]

আরো এসেছে, “যারা এটা বিশ্বাস করে না তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায় [সূরা আশ-শূরাঃ ১৮]। মোটকথাঃ তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার কাছে বিপদ নাযিল হওয়ার তাগাদা করে যে, আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আযাব এনে দিন। এতে বুঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবাস্তব অথবা অসম্ভব মনে করে। এটা ছিল তাদের অবিশ্বাস, কুফরি, অবাধ্যতা, বিরোধিতা ও অস্বীকৃতির চরম পর্যায়। তাই আল্লাহ তা’আলা বলছেন, অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আযাব এসেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। তাদেরকে এর মাধ্যমে আল্লাহ পরবর্তীদের জন্য উদাহরণ, উপদেশ হিসেবে রেখে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] এমতাবস্থায় তাদের উপর আযাব অবাস্তব হল কিরূপে? এখানে مثلات শব্দটি مثله এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। [ফাতহুল কাদীর]

বলা হয়েছে, “মানুষের সীমালংঘন সত্বেও আপনার রব তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল”। মানুষের শত অন্যায়কেও তিনি ক্ষমা করেন। যদি তিনি ক্ষমাশীল না হতেন তবে কারোই রেহাই ছিল না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ তো আছেন তার বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।” [সূরা ফাতিরঃ ৪৫]

আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, তিনি যে শুধু ক্ষমাশীল তা-ই নয় বরং তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর বান্দাকে আশা ও ভীতির মধ্যে রাখেন। [যেমন, সূরা আল-আনআমঃ ১৪৭, সূরা আল-আরাফঃ ১৬৭, সূরা আল-হিজরঃ ৪৯–৫০] যাতে করে মানুষের জীবনে ভারসাম্য বজায় থাকে। শুধু আশার বাণী শুনতে শুনতে মানুষ সীমালঙ্ঘন করতে দ্বিধা করবে না। আবার শুধু ভয়-ভীতির কথা শুনতে শুনতে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে না। এটাই আল্লাহ তা'আলা চান। সে জন্য তিনি যখনই কোন আশার কথা শুনিয়েছেন সাথে সাথেই ভয়ের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। মূলতঃ আশা ও ভীতির মাঝেই হলো ঈমানের অবস্থান। [ইবন কাসীর]

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তার রবের কাছ থেকে তার উপর কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন? আপনি তো শুধু সতর্ককারী, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক।

কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রাসূলের কাছে বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এখানে তারা এমন নিশানীর কথা বলতে চাচ্ছিল যা দেখে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর রাসূল হবার উপর ঈমান আনতে পারে। এটা ছিল মূলতঃ তাদের গোঁড়ামী। যেমন এর পূর্বেও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করার অযথা আব্দার করেছিল। তারা আরও বলেছিল যে, আপনি মক্কার পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দিন। সে পাহাড়ের জায়গায় নদী-নালার ব্যবস্থা করে দিন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আর আমাদেরকে নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে শুধু এটাই বিরত রেখেছে যে, তাদের পূর্ববর্তীগণ তাতে মিথ্যারোপ করেছিল।" [সূরা আল-ইসরাঃ ৫৯] [ইবন কাসীর] মু'জিযা প্রকাশ করা সরাসরি আল্লাহর কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন। তিনি কারো দাবী ও ইচ্ছা পূরণ করতে বাধ্য নন। এ জন্যই বলা হয়েছেঃ (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ) অর্থাৎ আপনার কাজ শুধু আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা।

আপনি তো শুধু সতর্ককারী, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক- আয়াতের কয়েকটি অর্থ করা হয়ে থাকে। এক. আপনি তো একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী আর প্রতিটি কাওমের জন্য রয়েছে হিদায়াতকারী নবী, যিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করবেন। [বাগভী; ইবন কাসীর] দুই. আপনি তো একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী এবং প্রতিটি কাওমের জন্যও আপনি হিদায়াতকারী অর্থাৎ আহবানকারী। [বাগভী; ইবন কাসীর] তিন. সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, এর অর্থ আপনি তো একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী। আর সত্যিকার হিদায়াতকারী তো আল্লাহ তা'আলাই। [বাগভী; ইবন কাসীর]

প্রথম মতটিকে ইমাম শানকীতী প্রাধান্য দিয়ে বলেন, এর সমার্থে অন্যত্র এসেছে, "আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য আছে একজন রাসূল।" [সূরা ইউনুস: ৪৭] আরও এসেছে, "আর এমন কোন উম্মত নেই যার কাছে গত হয়নি সতর্ককারী।" [সূরা ফাতির: ২৪] আরও এসেছে, "আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম।" [সূরা আন-নাহ্ল: ৩৬]

ফুটনোট

➢ সূরা রাদে তাওহীদ, রেসালাত এবং কিয়ামতের আলোচনা রয়েছে

➢ নবী ﷺ তিনটি মৌলিক বিষয়ের দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন -

- এক, প্রভুত্বের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।
- দুই, এ জীবনের পরে আর একটি জীবন আছে।
- তিন, তিনি আল্লাহর রসূল।

➢ তিনি আসমানসমূহকে কোন খুঁটি ব্যতীত উপরে উঠিয়েছেন, তিনি আরশের উপর উঠেছেন, সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন, তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন, সব রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, আল্লাহ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন- এইগুলোকে বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী ও সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

➢ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে আমরা রবের সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারি। এইগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারি।

➢ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আরো কিছু নিদর্শনাবলী হলো-

- সারা পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য ভূখণ্ড, এ ভূখণ্ডগুলো পরস্পর সংলগ্ন থাকা সত্ত্বেও আকার-আকৃতি, রং, গঠন, উপাদান, বৈশিষ্ট, শক্তি ও যোগ্যতা এবং উৎপাদনে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে।
- একই জমি ও একই পানি, কিন্তু তা থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছ কিন্তু তার প্রত্যেকটি ফল একই জাতের হওয়া সত্বেও তাদের আকৃতি, আয়তন, স্বাদ, গন্ধ, রূপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা।

➢ একই জমিনের একই গাছের ফলের স্বাদ ভিন্ন যেমন হয়ে থাকেন তেমনি মুফাসসিরদের মতে, এটা আদম সন্তানদের জন্য একটি উদাহরণ, তাদের মধ্যে নেককার ও বদকার হয়েছে অথচ তাদের পিতা একজনই।

➢ ৫-৭ আয়াতগুলোতে কাফেরদের মৌলিক তিনটি সন্দেহ ও তার উত্তর দেয়া হয়েছে। সন্দেহগুলো হচ্ছে,

এক. মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশর অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

দুই. যদি বাস্তবিকই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন?

তিন. আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক মু'জিযা দেখেছি কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন?

➢ প্রথম সন্দেহ মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাবের উত্তরে বলা হয়েছে-

- আসমান ও যমীন সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির চাইতে অনেক বড় ব্যাপার। আর যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে পারেন তার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অনেক সহজ।
- কাফেররা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিদর্শনাবলী ও প্রমাণসমূহ দেখে তিনি যা ইচ্ছে করতে সক্ষম এটার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য।
- যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তার পক্ষে পুনবার অস্তিত্বে আনা কঠিন নয়।

➢ রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে দুনিয়াতে কেন শাস্তি হয় না অথবা কাফির চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে দুনিয়াতে তাদের শাস্তি চাইলেও কেন দেওয়া হয় না এর উত্তরে বলা হয়েছে-

- ... যদি নির্ধারিত কাল না থাকত তবে শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর আসত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে।... (সূরা আনকাবুত) অর্থাৎ শাস্তি তার নির্ধারিত সময়েই আসবে এটা কারো চাওয়া না চাওয়ার উপর নয়।
- পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আযাব দুনিয়াতে এসেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ পরবর্তীদের জন্য উদাহরণ, উপদেশ হিসেবে রেখে দিয়েছেন।
- আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।
- মানুষের সীমালংঘন সত্বেও আপনার রব তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। নিদির্ষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন।
- তিনি যে শুধু ক্ষমাশীল তা-ই নয় বরং তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও।

➢ কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ বা দাবি ছিল রাসূল সাঃ আরো কিছু মুজিযা প্রকাশ করা যেমন- সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত অথবা মক্কার পাহাড়গুলো সরিয়ে নদী-নালার ব্যবস্থা করা। এর উত্তরে আল্লাহ্ বলেন-

- মু'জিযা প্রকাশ করা সরাসরি আল্লাহর কাজ। তিনি কারো দাবী ও ইচ্ছা পূরণ করতে বাধ্য নন।
- রাসূলের সাঃ কাজ শুধু আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা।

➢ কুরআনের বিভিন্ন জায়গা আল্লাহ্ আশার কথা শুনিয়েছেন সাথে সাথেই ভয়ের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। মূলতঃ আশা ও ভীতির মাঝেই হলো ঈমানের অবস্থান।